নৈতিক বাধ্যতার তত্ত্বরূপে উপযোগবাদ: সমকালীন ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, পি. এইচ. ডি. গবেষক,

দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

(সংক্ষিপ্তসার)

মানুষ দুটি বৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে— একটি তার জীববৃত্তি অন্যটি বুদ্ধিবৃত্তি। জীব তথা প্রাণী হিসাবে সে অন্যান্য জীবের মতোই জৈবিক সুখ কামনা করে। এ ব্যাপারে যে কোনো পশুর সঙ্গে সে একই সারিতে দাঁড়িয়ে। স্থূল ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা যেমন পশুকে তাড়িত করে এবং কর্মে প্রবৃত্ত করে; তেমনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা প্রভৃতি তাড়নাগুলি মানুষকে তাড়িত করে এবং নিজ নিজ কর্মে প্রণোদিত করে। কাজেই তার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম স্বার্থ প্রণোদিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ একান্তভাবে সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। তাই সমাজের সকলকে বঞ্চিত করে আপন ইচ্ছা পূরণের স্বার্থপর খেলায় সে মেতে উঠতে পারে না। এর অর্থ এই নয় যে অন্য পশুকুল সামাজিক নয়, বা তাদের সব কর্মই স্বার্থপ্রণোদিত। সন্তান বা সঙ্গী রক্ষায় আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত পশুকুলেও রয়েছে। কিন্তু তাদের সেই স্বার্থত্যাগ বা পরার্থ কর্ম প্রায় পুরোটাই নির্ধারিত হয় সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা। সেখানে বিচারবুদ্ধির হস্তক্ষেপ নেই বললেই চলে। সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা মানুষ যে তাড়িত হয় না এমন নয়। তার বহু কর্মই সহজাত প্রবৃত্তির অধীন। কিন্তু মানুষের মধ্যে রয়েছে বিচারশীলতা, মননশীলতা ও নৈতিকতাবোধ। তাই পশুরা যতখানি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের কর্তব্য ঠিক করে ফেলে মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। একদিকে সহজ প্রবৃত্তির স্বাভাবিক দাবি, অন্যদিকে বিচারবোধ ও নৈতিকতার দায়— এই দুয়ের দ্বন্দ্বে সে পড়ে উভয়সংকটে।

এই সংকট আরও ঘনীভূত হয় ইচ্ছাপূরণের সীমাবদ্ধ সুযোগের কারণে। ইচ্ছাপূরণের স্বাধীনতা মানুষের নেই বললেই চলে। যেখানে খুশি, যেমন খুশি, যেভাবে খুশি ঈপ্সিত কর্ম সে করতে পারে না; যে কর্ম তার ঈপ্সিত নয় তা থেকে হাত গুটিয়েও থাকতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মে তার জীবনের অধিকাংশটাই নিয়ন্ত্রিত। জর্জ বার্নাড শ যেমন বলেছেন, সারাদিনে মানুষ যে চব্বিশ ঘন্টা কাজ করার জন্য পায় তার অর্ধেক অর্থাৎ বারো ঘণ্টাই তার কেটে যায় প্রকৃতির দাসত্বে। খাদ্য, পানীয় গ্রহণ, নিদ্রা ইত্যাদি কর্মে অন্য পশুদের মতো দিনের অর্ধেকটা তাকে ব্যয় করতে হয়। অবশিষ্ট বারো ঘণ্টার মধ্যে তার আট ঘণ্টা কাটে নিজের ও স্বজনের জীবন নির্বাহের জন্য অর্থ উপার্জনে কিংবা চাষবাস, উৎপাদন ইত্যাদি কর্মে। কাজেই জীবনের অধিকাংশ সময়ই তার কেটে যায় শৃঙ্খলার বন্ধনে। অবশিষ্ট চার ঘণ্টাতেও সে যে খুব স্বাধীন তা নয়, কারণ ইচ্ছাপূরণের উপায় বা উপকরণ তার কাছে পর্যাপ্ত নয়। এই সীমাবদ্ধ পরিসরে তার ইচ্ছাপূরণ যখন পদে পদে শুধু ব্যাহতই হয়; তখন অন্যের জন্য, সমাজের জন্য কিছু করার যে উপদেশ পিতামাতা বা শিক্ষকেরা তাকে দেন তাতে তার বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল, পদে পদে শত শত বিধি নিষেধের ডোরে তার ইচ্ছাগুলোকে বাঁধা পড়তে দেখেও ওইসব উপদেশকে অবজ্ঞা করতে পারে না। বরং চেষ্টা করে সাধ্যমত সেই দাবিগুলো পূরণের। প্রশ্ন হল পরের জন্য কিছু করার এই তাগিদ, এই বাধ্যতাবোধ মানুষের মধ্যে আসে কোথা থেকে? এই বোধ যদি নিছক জৈবিক হতো তাহলে মনুষ্যতরের মধ্যেও তা সমভাবে দৃষ্ট হত। কাজেই এই নৈতিক বাধ্যতাবোধকে পুরোপুরি প্রাকৃতিক বলা যায় না। তাই প্রশ্ন থেকে যায় এই নৈতিক বাধ্যতার উৎস কোথায়? প্রশ্নটির উত্তর জানা খুবই জরুরি। শৈশব থেকেই অন্যের জন্য কিছু করার একটা তাগিদ মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অন্যের দুঃখ-কষ্ট তাকে যেমন কাতর করে

তেমনই অন্যের প্রয়োজনে কষ্ট সইতে বহুক্ষেত্রেই সে প্রস্তুত। বাড়ির অভিভাবকদের লুকিয়ে নিজের টিফিনের অনেকখানি বন্ধুদের খাইয়ে সে আনন্দ পায়। এই যে পরার্থবোধ ও পরার্থপ্রবৃত্তি শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়, এর প্রণোদন ঠিক কোথায়? পাশ্চাত্ত্য নীতিদর্শনের প্রেক্ষিতে এই ধরণের প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হলেও, সাধারণভাবে এগুলি প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য নির্বিশেষে সকল দার্শনিকের জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করা এই গবেষণা কর্মে বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

অন্যের জন্য মানুষ কেন কিছু করে বা করবে তার নানাবিধ উত্তর যেমন ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি দিয়েছে, তেমনই এর নানা ব্যাখ্যা পাশ্চাত্ত্য নীতিদর্শনেও লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় হল পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদী নীতিদার্শনিকদের ব্যাখ্যা। কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোরতা এবং আত্মসুখের স্বার্থপরতা, দুটিতেই মানুষ যখন অনাস্থা জ্ঞাপন শুরু করেছে ঠিক সেই পটভূমিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে থেকে ইউরোপে ইউটিলিটি তত্ত্ব বা উপযোগবাদের যাত্রা শুরু। উপযোগবাদের যেমন নানারূপ আছে, তেমনি উপযোগের ব্যাখ্যাও সর্বত্র এক নয়। তথাপি পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদীদের প্রায় সবাই ‘সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ’-এর আদর্শটিকে অনুমোদন করেন। যা যত বেশি উপযোগী, তা যে তত বেশি গ্রহণযোগ্য— এমন একটা ধারণা সাধারণ্যেও প্রচলিত। মানুষ তার ঈপ্সিত সুখকে যেমন অস্বীকার করতে পারে না, তেমনি স্থূল আত্মসুখের মধ্যে স্বার্থপর জীবনযাপনও সামাজিক জীব হিসাবে তার অনুমোদন পায় না। অন্যের প্রতি কর্তব্যের দায়ও সে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে সমস্তরকম বাহ্য প্রাপ্তিকে তুচ্ছ করে কর্তব্যের জীবনযাপনের কান্টীয় আদর্শকে মেনে নিতেও সে গররাজি। এই উভয়সংকট থেকে মুক্তি দেওয়ার একটা চেষ্টা সে খুঁজে পায় ইউটিলিটিতত্ত্বে।

ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সামাজিকস্বার্থকে যুক্ত করে যে উপযোগবাদের আবির্ভাব ঘটে, তা স্বাভাবিকভাবেই সুশীল সমাজের কাছে আদরণীয় হয়। সমাজরক্ষা ও নৈতিকতা রক্ষার যে প্রণোদন বিচারশীল মানুষের মধ্যে থাকে, তাকে ধর্মের ছত্রছায়া থেকে বের করে এনে যুক্তির উপর দাঁড় করানোর তাগিদও সে অনুভব করে। এ কারণে যুক্তিবাদী ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের ব্যক্তিমানসে উপযোগবাদ বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। তত্ত্ব হিসাবে উপযোগবাদের জনপ্রিয়তা ইউরোপের সীমা ছাড়িয়ে ছাপ ফেলেছিল সুদূর ভারতবর্ষে। ইংরেজ উপনিবেশ পরাধীন ভারতবর্ষ ইউরোপীয়দের নানা আদবকায়দা অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে, মনে মনে সায় দিতে শুরু করেছিল উপযোগবাদী নীতিতত্ত্বে। প্রশাসক হিসাবে ভারতবর্ষে জন স্টুয়ার্ট মিলের উপস্থিতি ভারতবর্ষে উপযোগবাদী চিন্তা বিস্তারের পথে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বেশকিছু ভারতীয় মনীষী এই নীতিদর্শনকে সাদরে গ্রহণ করেন। ইউটিলিটিতত্ত্ব সাধারণভাবে ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার আর একটি কারণও ছিল। হিতবাদের একটি পরম্পরা ভারতভূমিতে প্রচ্ছন্নই ছিল। সেই উর্বরা ভূমিতে পাশ্চাত্ত্য হিতবাদীতত্ত্ব হিসাবে উপযোগবাদ সহজেই উন্মেষিত হয়। চিরায়ত ভারতীয় হিতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদের মিল ঊনবিংশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়দের এই তত্ত্বটিকে গ্রহণে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু ক্রমশই তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদ ভারতীয় হিতবাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই উপলব্ধি থেকেই পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদ সম্বন্ধে বিরূপতা দেখা দেয় তাদের মধ্যে। বঙ্গমানসে এই প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেলেও, মহাত্মা গান্ধী থেকে রাধাকৃষ্ণণ, অনেক সমকালীন ভারতীয় চিন্তকই এই উপযোগবাদী ভাবধারা সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। মূলত উপযোগবাদ সম্বন্ধে সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের আপত্তিগুলি

সন্ধান করে দেখাই এই গবেষণার লক্ষ্য। কে কোন কারণে নৈতিক মতবাদ হিসাবে উপযোগবাদকে অপর্যাপ্ত বলে মনে করেন তা যেমন খতিয়ে দেখা দরকার, তেমনি নৈতিক বাধ্যতার উৎস নির্দেশ করতে এই তত্ত্ব ব্যর্থ বলে যে দাবি সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকরা করেন, তার যৌক্তিকতাও বিচার করে দেখা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নৈতিক বাধ্যতাবোধের যেসব ব্যাখ্যা চিরায়ত ভারতীয় দর্শন প্রস্তাব করে, সেই ব্যাখ্যা উপযোগবাদী ব্যাখ্যার তুলনায় উৎকৃষ্ট কিনা, যুক্তির কষ্টিপাথরে সেগুলিরও নির্ণয় হওয়া দরকার। সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে পাঁচটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে, যা ছাড়াও রয়েছে ভূমিকা ও উপসংহার।